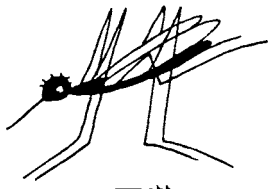

Mosha (Mosquito)

# মশা

গল্পটাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা, সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে পারছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ানো, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই শুরু করা বোধ হয় উচিত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড়-বার-করা এমন একরকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোনও বয়সই তাঁর হতে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, "দুনিয়াময় টহলদারি করে বেড়াতে বেড়াতে বয়সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি! তবে—" বলে ঘনাদা যে গল্পটা শুরু করেন, সেটা কখনও সিপাই মিউটিনির, কখনও বা রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার। সুতরাং ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দুশো বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যাননি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই।

কয়েক বছর হল কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটিছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, কিন্তু সাধারণত সেটা মাসের শেষে, মেসের খরচের তাগাদা পড়বার সময়। বুঝে শুনে কিংবা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে ভাল আরাম-কেদারাটায় বসেন, যার ভাগ্য যেদিন ভাল থাকে, তার কাছে সেদিন সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ বুজে প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো আমাদের কোনও একটা কথায় বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়ে চড়ে উঠে বসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, "কী কথা হচ্ছিল—বন্যার?"

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান, মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভাল ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, "টাইড্যাল ওয়েভ কাকে বলে জানো? দেখেছ কখনও সেই প্রলয়ের ঢেউ—যাকে বলে সমুদ্র-জলোচ্ছ্বাস!"

সংকুচিতভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বললেন, "কেমন করে আর থাকবে! তা হলে শোনো। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি দ্বীপে গিয়ে উঠেছি..."

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কী করে এই রকম এক টাইড্যাল ওয়েভের মাথায় এক বেলায় তাহিতি থেকে একেবারে ফিজি দ্বীপে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনার পর আমাদের অবস্থা কী হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্যের সামনে মিটমিটে লণ্ঠনের মতো আর কী!

ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়। কিন্তু আটঘাট বেঁধে যতই কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায়, ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন!

হয়তো কথায় কথায় কে বলেছে যে, আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা—চোখের জোর আর বড় বেশি নেই। ঘনাদা তাঁর মার্কা-মারা হাসিটি হেসে অমনই গিয়ে উঠলেন একেবারে অ্যান্ডিজ পাহাড়ের চুড়োয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি 'কন্ডর' শকুনের বাসার খোঁজে।

"হ্যাঁ, চোখের জোর দেখেছি বটে সেবার! অ্যান্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার জোগাড়, সঙ্গে একজন আর্জেনটাইন শিকারি আর বোরোরো জাতের এক সাড়ে ছ-ফুট লম্বা রেড ইন্ডিয়ান গাইড। সন্ধ্যা হয়-হয়, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়োর নীচেকার খানিকটা মেঘ একটু ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কী আর দেখা যাবে। কিন্তু তখনও বোরোরো জাতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা তো জানি না। হাত দুটো দূরবিনের মতো করে সে একবার চোখের সামনে ধরলে, তারপর বললে 'ব্যস, আর ভয় নেই!'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় তো নেই, কিন্তু কী দেখতে পেলে তুমি?'

সে হেসে বললে, 'কেন, ওই তো নীচে শিকারিদের তাঁবু ফেলা রয়েছে, বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট-পরা এক শিকারি এইমাত্র তাঁবুতে ঢুকল—'

শুনে আমি তো অবাক।"

ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততোধিক অবাক হয়ে বললাম, "বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রঙের কোট পর্যন্ত দেখতে পেলে!"

"তা না হলে আর চোখের জোর কীসের! শকুনের চোখ কী রকম জানো? দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গোরুর লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোরো শিকারিদের চোখ তেমনই।"

এরপর আমরা যে নির্বাক হয়ে গেলাম তা বলা বাহুল্য।

প্রায় নির্বাক হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কী থেকে বুঝি মশার প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছোননি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস। তা ছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরি হল না। বিপিন সবে তাদের গাঁয়ে কী ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে। হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব।

"কী কথা হচ্ছিল হে?"

আমরা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বলি, "নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।"

বিপিন তাড়াতাড়ি আরাম-কেদারাটা ছেড়ে সসম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বললেন, "ওঃ, মশা!"

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক, ঘনাদার দৃষ্টি তা হলে মশা পর্যন্ত পৌঁছোবে না! কিন্তু পরমুহূর্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একেবারে অ্যাটমিক!

"হ্যাঁ, মেরেছিলাম একবার একটা মশা।"

আমরা স্তম্ভিত! ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, স্তম্ভিত, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশাই যদি মারতে হয়, তা হলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন, এ যে কল্পনাও করা যায় না!

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল, "একটি মশা মেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ, একটিমাত্র মশাই জীবনে মেরেছি।" আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চললেন, "মেরেছি ১৯৩৯ সালের ৫ অগাস্ট, সাখালীন দ্বীপে!"

আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মতো উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিকটা ছিল জাপানিদের, আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পুবদিকের সমুদ্রকূলে তখন অ্যাম্বার সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডববর্জিত জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ। বছরের অর্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, আর বাকি অর্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষার-ঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াশা। কোনও রকমে দামি কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহ করেই সেমুখো আর হব না এই ছিল মতলব। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানির তানলিন নামে এক চিনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ—তার সঙ্গে এ পর্যন্ত যা অ্যাম্বার জোগাড় হয়েছিল, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামূল্য থলিটাও।

সাখালীন দ্বীপটি তো নেহাত ছোটখাটো নয়, তার বেশির ভাগ আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মতো দামি রত্ন চুরি করে সাখালীন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর লাভ নেই। সে চোরাই মাল বেচতে তাকে কোনও বড় সভ্য দেশে যেতেই হবে। আর সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেকজ্যানড্রোভসক থেকে ব্লাডিভস্টকের স্টিমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা স্লেজে করে পালানো সম্ভব। কিন্তু প্রধান স্টিমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে তার আগে চোর কিছুতেই সাখালীন থেকে বেরুতে পারবে না। অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে বার করবার সময় অন্তত আমরা পাব।

বেতারে অ্যালেকজ্যানড্রোভসক-এর পুলিশের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মি. মার্টিন দুজন কুলি নিয়ে তানলিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিস পেয়ে গেলাম।

টিয়ারা পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁবু ফেলেছি। ওখানকার আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারির কাছে সকালবেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক দিয়ে একজন চিনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মতো কোনও প্রমাণ পাইনি।

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোনো একরকম অসম্ভব। সাখালীন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শুধু ভালুক ছাড়া আর কিছু নেই। সাধারণত তারা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মি. মার্টিন তাই কোনও রকমে ঘুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'দেখেছেন, মি. মার্টিন!'

মি. মার্টিনের দৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! বেশ জোরালো আলো বলে মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ওরকম আলো আসছে কোথা থেকে? ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?'

খানিকক্ষণ লক্ষ করে বললাম, 'না, ভুতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দূরের ওই পাহাড়ে ঢিবিটার পেছনে নিশ্চয় কোনও একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।'

মি. মার্টিন অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু এখানে শখ করে অমন বাড়ি করবে কে? গিলিয়াক, ওরোক বা টুঙ্গুস জাতের অসভ্য শিকারি ছাড়া এ অঞ্চলে তো কেউ আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

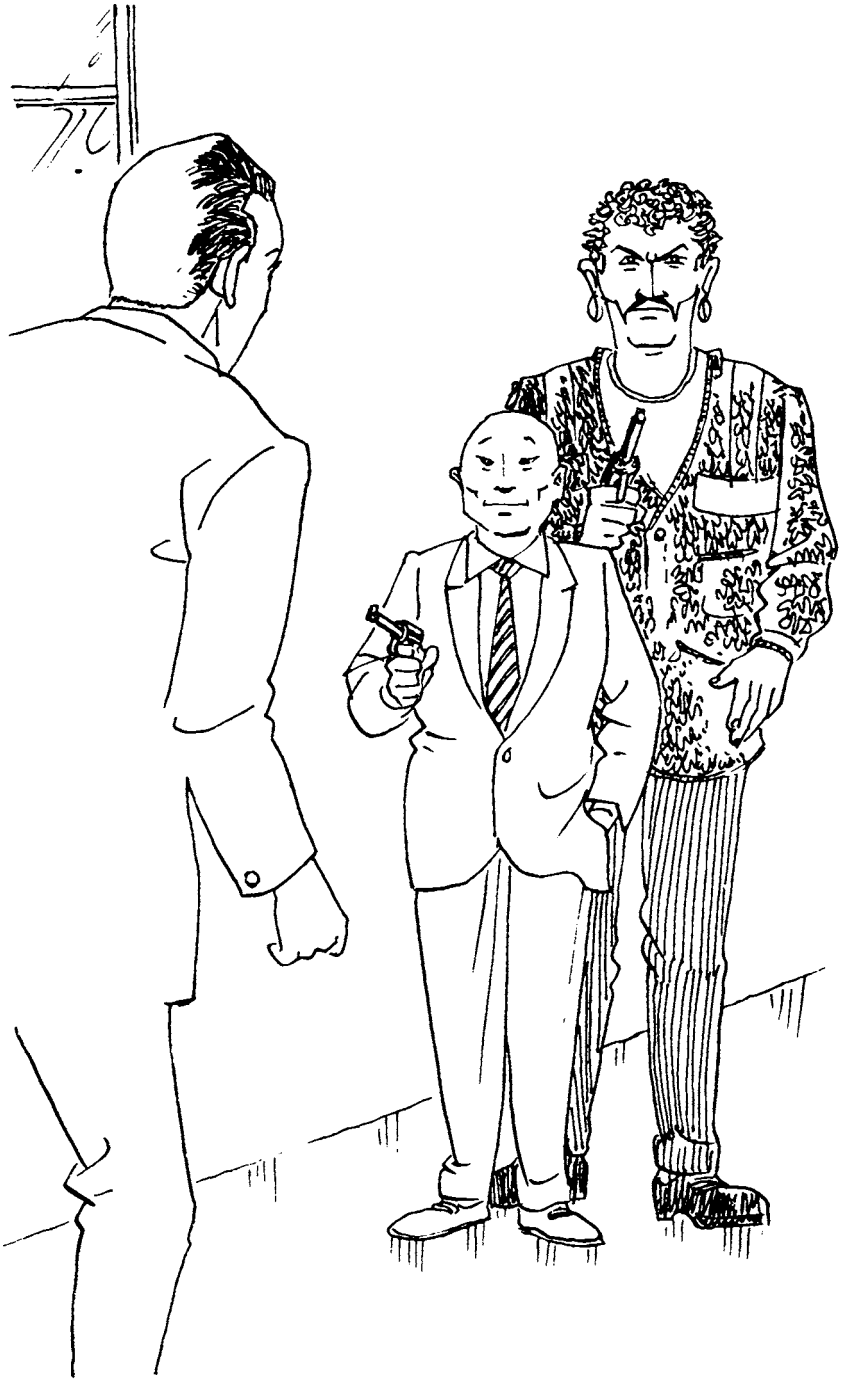

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এদিকে কোনও খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল যত বেশিই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমানুষিক চিৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মি. মার্টিন দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম, তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বের করে এনে কোনও কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র যে আমরা ছিলাম না তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। দুজনের কোমর-বন্ধেই পিস্তল আঁটা ছিল।

যে পাথুরে ঢিবিটার পেছন থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা খুব বেশি দূর নয়, প্রায় শ তিনেক গজ হবে। ঢিবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার পরই দেখা গেল আমাদের অনুমান ভুল হয়নি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ির একটা জানালা থেকে উজ্জ্বল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অমানুষিক যে চিৎকার আমরা শুনেছিলাম তা একবার উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিধার এমন শান্ত যে দুজনে একসঙ্গে সে শব্দ না শুনলে মনের ভুল বলেই সেটা গণ্য করতাম।

বাড়িটার কাছে এসে তখন আমরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছি। এখন করা যায় কী! অজানা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়িতে হঠাৎ মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি করাটা মোটেই সুবিধের হবে না, তা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু ফিরে যাওয়া তো তখন আর যায় না।

যে জানালাটা দিয়ে আলো আসছিল সেখানে গিয়ে সাবধানে একবার উঁকি দিলাম। মস্ত বড় একটা ঘর, মিউজিয়াম যেমন থাকে অনেকটা সেইরকম। প্রকাণ্ড একটা কাচে ঘেরা টেবিল ঘরটার মাঝখানে বসানো। সে কাচের ভেতর কী আছে দেখতে পেলাম না। লোকজনও কেউ সেখানে নেই। এত রাত্রে থাকবার কথাও না।

সেখান থেকে সরে এসে দরজায় ধাক্কা দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে সরু অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ইংরেজিতে এক আদেশ শুনলাম, 'প্রাণে বাঁচতে চাও তো হাত তোলো—'

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, বেঁটে গোছের জোয়ান একটি লোক আমাদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তার পেছনে লম্বা-চওড়া যমদূতের মতো চেহারার এক প্রহরী; তারও হাতে পিস্তল।

ব্যাপারটা বেশ নাটুকে হয়ে জমে উঠেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের পরিচয় পাওয়ার পর সব আবার থিতিয়ে সহজ হয়ে গেল।

পিস্তল হাতে যিনি আমাদের হাত তুলতে বলেছিলেন, জানতে পারলাম, তিনি মি. নিশিমারা নামে একজন জাপানি কীটতত্ত্ববিদ। সাখালীনের কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার জন্য এই ঘাঁটিটি বসিয়েছেন। আমরা কী উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম শোনবার পর লজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কয়েকদিন তাঁর ওখানে থেকে তাঁর কাজকর্ম দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলাতক চিনা মজুরের সন্ধান তাঁর লোকজনের মারফত তিনিই করিয়ে দেবেন। এ অঞ্চল তাঁর একরকম হাতের মুঠোয়। তাঁর লোকজনের হাত এড়িয়ে কারুর পালাবার ক্ষমতা নেই।

কথাটা যে কতখানি সত্য, একদিন পার না হতেই বুঝতে পারলাম। পরের দিন সকালেই মি. নিশিমারা তাঁর গবেষণাগার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণ কীটতত্ত্বের গবেষণা তিনি যে করেন না, তাঁর ল্যাবরেটরির নানা বিভাগ দেখেই তা অবশ্য বোঝা যায়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, কীটপতঙ্গ লালন-পালন ও পরিবর্ধন করবার জন্য রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরিতে আছে।

মি. মার্টিন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোকা-মাকড়ের ভেতর মশাই দেখছি আপনার গবেষণার প্রধান বিষয়।'

মি. নিশিমারা একটু হেসে বললেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে? মানুষের সভ্যতার মশাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাখালীন দ্বীপ থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ম্যালেরিয়ার বাহন হিসেবে মশা কী পরিমাণ ক্ষতি প্রতিনিয়ত করছে, ডাক্তার হিসেবে আপনার নিশ্চয় অজানা নয়।'

মি. মার্টিন বললেন, 'কিন্তু আপনার গবেষণাগারে তো দেখছি মশার লালন-পালনই হল আসল কাজ। এর দ্বারা ম্যালেরিয়ার কী প্রতিকার হবে বুঝতে পারছি না।'

নিশিমারা আবার হেসে বললেন, 'না বোঝবারই কথা। শুধু মশা মেরে নয়, মশা যাতে আর ম্যালেরিয়ার বাহন না হতে পারে, সেই চেষ্টা করে আমি ম্যালেরিয়া সমস্যার নতুন ভাবে সমাধান করতে চাই।'

আমাদের একটু অবাক হতে দেখে তিনি বললেন, 'মশা কী করে রোগের জীবাণু ছড়ায় আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারি যন্ত্রের বাক্স বললেই হয়। গায়ের ওপর বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় যন্ত্র-নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়।

আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর যদি কোনও উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তা হলে মশা হাজার কামড়ালেও আর আমাদের ভয় নেই। আমার গবেষণাগারে মশার লালা-পরিবর্তনের সেই চেষ্টাই আমি করছি।'

বিশ্বাস করি না করি, নিশিমারার কথায় প্রতিবাদ কিছু করিনি। সমস্ত গবেষণাগারটা আমাদের কাছে তখনই কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে। আগের রাত্রের সেই অমানুষিক চিৎকারের শব্দের কথা তখনও ভুলতে পারিনি। নিশিমারাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেটা কোনও বন্য জন্তুর আওয়াজ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয়েছে কিছু যেন তিনি গোপন করে যাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই গোপন রহস্য যে কী, সেইদিন রাত্রেই টের পেলাম। নিশিমারা আমাদের যত্ন-আতিথ্যের কোনও ত্রুটি করেননি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তখন আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুতে এসেছি, হঠাৎ মি. মার্টিন বললেন, 'এরই মধ্যে শুয়ে কী হবে? আসুন একটু বাইরে ঘুরে আসি।' তাঁর কথায় রাজি হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ!

'এর মানে?' মি. মার্টিন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

মানে ঠিক না বুঝতে পারলেও এই দরজা বন্ধ করার পেছনে যে কোনও শয়তানি মতলব আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ তখন আর আমাদের নেই।

কিন্তু এত সহজে আমরা হার মানব কেন? ছাদের কাছে হাওয়া চলাচলের একটা ছোট ভেন্টিলেটর ছিল। কোনও রকমে তারই পাল্লা ভেঙে দুজনে সেখান দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে নামলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। শুধু ল্যাবরেটরির একটা ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। সন্তর্পণে সেই ঘরটার পেছনে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সেই কালকের রাতের মতো রক্ত জল-করা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানালা বেয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু এ কী ব্যাপার! যার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি, সেই তানলিনই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে অসীম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার একপাশে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম সেই যমদূতের মতো কাফ্রি প্রহরী দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে ফাঁপা একটা কাঁচের মোটা নলের জিনিস হাতে করে মি. নিশিমারা।

'ব্যাপার কী, মি. নিশিমারা?' বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম। মি. নিশিমারা আমাদের দেখে রাগে বিস্ময়ে খানিক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার আতিথেয়তার ওপর একটু বেশি অত্যাচার করছেন নাকি আপনারা? এ ঘরে আসতে কে আপনাদের অনুমতি দিয়েছে?'

'কেউ দেয়নি, এখন বলুন এখানে হচ্ছে কী?'

মি. নিশিমারা অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, 'যা হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এ লোকটাকে সাপে কামড়েছে, তারই চিকিৎসা করছিলাম।' মি. মার্টিন তখন মেঝেয় বসে পড়ে তানলিনকেই পরীক্ষা করছিলেন। তিনি মুখ তুলে কঠিন স্বরে বললেন, 'এ তো মারা গেছে। আর সাপেও একে কামড়ায়নি। বলুন, কী করেছেন একে?'

'কী করেছি জানতে চান?' নিশিমারা কখন এরই মধ্যে কোথা থেকে একটা পিস্তল হাতে নিয়েছেন লক্ষই করিনি। সেইটে আমাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে তিনি বললেন, 'বেশ, সেই কথাই বলব তা হলে, শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে মরার সৌভাগ্য আপনাদেরই হোক। আপনাদের তানলিন সাপের কামড়ে মারা যায়নি—মারা গেছে মশার কামড়ে—সামান্য একটা মশার কামড়ে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশিমরা তীক্ষ্ণ উচ্চ অট্টাহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন, 'বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা, কেমন? কোনও ভাবনা নেই, এক্ষুনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই, শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম, মনে আছে তো? সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে শুরু করে মশা যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে যে চিৎকার শুনেছিলেন, সে এমনই একজনের ওপর মশার কামড়ের পরীক্ষার ফল। তানলিনের অবস্থা তো সামনেই দেখতে পাচ্ছেন— এইবার আপনার পালা।'

নিশিমারার ইঙ্গিতে সেই যমদূত তখন মি. মার্টিনকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশিমারা বললেন, 'এই কাঁচের নল দেখছেন, এর ভেতর একটি মাত্র বিষাক্ত মশা ভরা আছে। এই একটি মশা কিন্তু এখনও আপনার মতো জনবিশেক জোয়ানকে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি বিজ্ঞানের পীঠস্থান, সভ্য মার্কিন মুলুকের লোক। তাই আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রাণ দেওয়ার গৌরব আমি আপনাকেই দিতে চাই। বেশি কিছু আপনাকে করতে হবে না। এই নলটি এমন কায়দায় তৈরি যে গায়ে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঢাকনাটা ভেতর দিকে খুলে যায়—হিংস্র মশাটাও উড়ে এসে কামড়ে দিতে দেরি করে না...'

সমস্ত মাথার ভেতর কেমন ঝিমঝিম করছিল! মনে হচ্ছিল আর যেন দাঁড়াতে পারব না! কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সজোরে একটা ঘুষি ছুঁড়লাম। নিশিমারা আচমকা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কাঁচের নলটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা করো যে, ভাঙা নল থেকে বেরিয়ে সেই সাক্ষাৎ শমন ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে আর চারজন মানুষ উন্মাদ হয়ে তাকে এড়িয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছে—ঘরের মাঝখানে আবার তানলিনের মৃতদেহ।

কোনওরকমে দরজার কাছে পৌঁছে খিলটা খুলে বেরুতে যাব, এমন সময় সেই বিশাল কাফ্রি বাঘের মতো আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

আর বুঝি আশা নেই! মশাটা ঠিক আমার নাকের কাছে একবার ঘুরে গেল। তার পরেই সেই কাফ্রি এক সঙ্গে পাঁচটা রেলের ইঞ্জিনের মতো চিৎকার করে আমার ঘাড়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, মশার দংশন-জ্বালার সঙ্গে সব জ্বালা তার জুড়িয়েছে।

কিছু ভাববার আর সময় নেই। উঠে পড়ে আবার পালাতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি, মি. নিশিমারা যুযুৎসুর প্যাঁচে মি. মার্টিনকে চিত করে ফেলে দিয়েছেন আর মশাটা ঠিক তার মাথার কাছে উড়ছে। ছুটে গিয়ে হেঁচকা টান দিয়ে মি. মার্টিনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা সরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিশিমারার আর্তনাদ শোনা গেল! মশাটা ঠিক তাঁর গালের ওপর গিয়ে বসেছে।

এবার আর একমুহূর্ত দেরি হল না। আমার প্রচণ্ড এক চাপড় গিয়ে পড়ল নিশিমারার গালে। মশা আর নিশিমারার ভবলীলা একসঙ্গেই সাঙ্গ হয়ে গেল!"

মশা মারবার পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘনাদা বললেন, "জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয়নি।"

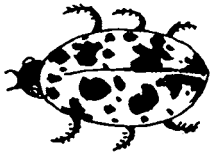

Poka

## পোকা

ঘনাদা সেদিন প্রায় জব্দ হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রায় জব্দ এই জন্য যে সত্যিকারের জব্দ হবার পাত্র ঘনাদা নন। যত বেকায়দায় পড়ুন না কেন, নিজেকে সামলে নেবার অসামান্য প্রতিভা ঘনাদার আছে। তেলা-মাছের মতো যে-কোনও বেয়াড়া অবস্থা থেকে তিনি পিছলে বেরিয়ে যেতে পারেন।

সেদিন কিন্তু অবস্থাটা তাঁর বড় বেশি কাহিল হয়ে উঠেছিল । মেসের সকলের হাসি-ঠাট্টার চোটে তাঁর এতদিনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রায় ভেসে যায় আর কি!

মেসের তেতলার একটি ছোট চোর-কুঠরি গোছের ঘরে ঘনাদা একা থাকেন। এই ব্যবস্থাটা শুধু তাঁর নিজেরই মনঃপূত নয়, আমাদেরও অনুমোদিত। ঘনাদার মতো অসামান্য পুরুষের সংস্পর্শে দিনরাত থাকা একটু বিপজ্জনক বলেই আমাদের ধারণা।

ঘনাদার তেতলার সেই ঘরে সেদিন রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে বলে আমাদের মনে হল। শনিবারের রাত। পরের দিন ছুটি, সুতরাং ভোরে উঠবার তাড়া নেই বলে আমরা সবাই যে যার দলে একটু বেশিক্ষণ পর্যন্ত তাস পাশা খেলে সবেমাত্র শুতে গেছি, এমন সময় টেবিল-চেয়ার ওলটানোর সঙ্গে ওপরকার ঘরে ঘনাদার অমানুষিক চিৎকারে বিছানা থেকে উঠে বসলাম!

ব্যাপার কী!

তাস পাশা ইত্যাদি খেলা ঘনাদার দুচক্ষের বিষ। শনিবার রাত্রে তাই তিনি আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে অন্যান্যদিনের চেয়ে একটু সকাল সকালই শুতে চলে যান। তারপর ওপরের ঘরে আলবোলায় তাঁর আরাম করে তামাক খাওয়ার শব্দ কখন করাতে কাঠ-চেরার মতো মধুর নাক-ডাকার আওয়াজে মিশে যায়, সমস্তই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~